খেলা গড়ার খেলা : অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো

মৈত্রীশ ঘটক

এক

উন্নয়নের জন্য চাই রাস্তাঘাট, রাস্তা তৈরি হলো। কিছুদিনের মধ্যেই রাস্তায় বড় বড় গর্ত। কন্ট্রাক্টর ভেজাল মিশিয়েছে। ট্রাফিকের নিয়ম। কেউ মানে না। জায়গায় জায়গায় মাল-ভর্তি লরি দাঁড় করিয়ে পুলিশ ঘুষ নেয়। উন্নয়নের খেলা ভেঙে যায়।

উন্নয়নের জন্য চাই শিক্ষার বিস্তার। সরকারি অনুদানে চলে গ্রামের স্কুল, শিক্ষকেরা অনেকেই অনুপস্থিত। কেউ রাজনৈতিক কাজে ব্যস্ত, কেউ প্রাইভেট টিউশানে। আর কেউ কেউ একক অভিমন্যু, ভাঙা স্কুলবাড়ি, উপকরণহীন ক্লাসঘর, আর তাতে ভিড় করে আসা অর্ধভুক্ত ছাত্রদের চোখের প্রত্যাশার ব্যূহে। উন্নয়নের খেলা ভেঙে যায়।

দায়ী কে? কেউ বলে সরকার; কেউ বলে বাজার, আর কেউ বলে সব ঝুটা হ্যায় : 'ঢের সম্রাটের রাজ্যে বাস করে জীব/অবশেষে একদিন দেখেছে দু-তিন-ধনু দূরে/কোথাও বাজার নেই তবুও সরকার নেই, চাষা/বলদের নিঃশব্দতা খেতের দুপুরে।'[১] বা আধুনিক অর্থনীতির পরিভাষায়, বাজারের ব্যর্থতা (market failure) আর সরকারের ব্যর্থতার (government failure) যুগলবন্দীতে ভেঙে যায় উন্নয়নের খেলা।

দুই

যেখানে মুনাফার সম্ভাবনা নেই, সেখানে বাজারের কোনো উৎসাহ নেই। শহরে প্রচুর বেসরকারি স্কুল আর নার্সিংহোম, গ্রামে নেই। তবু শহরেই নিত্যনতুন গজিয়ে ওঠে নতুন নতুন স্কুল, আর নার্সিংহোম, গ্রামে নেই, বাজারের দর্শনই হলো ফেল কড়ি মাখো তেল, তাই যার কড়ি নেই তাকে নিয়ে বাজারের কোনো মাথাব্যথা নেই। এখানে সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বাজারের যুক্তি টাকা যার মুলুক তার, কিন্তু গণতন্ত্রে সরকারের যুক্তি হলো ভোট যার মুলুক তার। নিন্দুকে বলতে পারেন টাকা (বা মুলুক) যার ভোট তার, কিন্তু হাজারো খুঁত সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গরিব-বড়লোক সবারই ভোট দেবার অধিকার আছে, আর দরিদ্র-শ্রেণীর মানুষেরা যেহেতু সমাজের একটা বড় অংশ, তাই সব ছেড়ে ভোটের রাজনীতির তাগিদেই সরকার এঁদের সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করতে পারে না।

কিন্তু এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের যেটা প্রধান গুণ, অর্থাৎ মুনাফার হিসেবে না চলা, সেটাই আবার তার প্রধান দুর্বলতা : সরকার নামক 'কোম্পানি'টির কোনো মালিক নেই। তাই ঠিক করে কাজ করা বা খরচ কমানো কোনো ব্যাপারে কোনো তাগিদ নেই।

একইভাবে, বাজার যেহেতু মুনাফার হিসেবে চলে তার ভালো দিক হলো ব্যয় সংকোচ করার বা আয় বাড়ানোর সুযোগ-সন্ধানে সে সদাজাগ্রত এবং তাতে অপচয় বা দীর্ঘসূত্রতা কমে। কিন্তু এই মুনাফা-ভিত্তিক মানসিকতার কুফল হলো সেই ব্যয়-সঙ্কোচ বা আয় বাড়ানো যদি লেনদেনের অন্যপক্ষ (যেমন ক্রেতা, শ্রমিক), পরিবেশ, বা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী হয়, সে ব্যাপারে বাজার উদাসীন।

যে উদাহরণগুলি দিয়ে শুরু করেছিলাম সেগুলিতে ফিরে আসি। রাস্তা তৈরি বা গ্রামে স্কুল খোলায় মুনাফা নেই, তাই বাজারের ওপর নির্ভর করে বসে থাকা যায় না। বাজারের ব্যর্থতার ভূত তাড়াতে চাই সরকারি ওঝা।

কিন্তু সর্ষের মধ্যেও যদি থাকে ভূত? সরকার নিজেই রাস্তা গড়ুক, বা দরকার পড়লে কোনো ঠিকাদারকেই নিযুক্ত করুক, সরকারি টাকার অপচয় আটকাতে কারোর কোনো গরজ নেই। সাধারণত বাজারের লেনদেনে ক্রেতা খারাপ জিনিস পেলে নিজের গরজে বিক্রেতার কাছে গিয়ে ফেরত দেবেন, ক্ষতিপূরণ আদায়ের চেষ্টা করবেন, বা ভবিষ্যতে অন্য বিক্রেতার কাছে যাবার সংকল্প করবেন। কিন্তু এখানে ক্রেতা

যেহেতু সরকার এবং ব্যবহারকারীদের সংখ্যা অগণ্য, কিছু সরকারি কর্মচারীকে হাতে রাখতে পারলে কারোর গরজ নেই রাস্তার খারাপ মানের জন্য ঠিকাদারের থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করার। একইরকমভাবে, সরকারি স্কুল বা হাসপাতালে শিক্ষক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের অনুপস্থিতি নিয়ে মাথা ঘামাবে কে? শুধু তাই না, এঁদের অনেকেই যেহেতু রাজনৈতিকভাবে সক্রিয়, ইচ্ছে থাকলেও তাঁদের স্পর্শ করা কঠিন।

বাজারি লেনদেনের ক্ষেত্রেও অবশ্য পূর্ব-বর্ণিত দায়বদ্ধতার যে কাঠামো (structure of accountability) তা খুব কার্যকর হবে না, যদি বাজারের ওপর বিক্রেতার একচেটিয়া আধিপত্য থাকে বা আইন ব্যবস্থা নড়বড়ে হয়।

তাই প্রশ্ন হলো, সরকার বা বাজার কে দাবি করবে কৈফিয়ত? কৈফিয়ত সন্তোষজনক না হলে, কে নেবে উপযুক্ত ব্যবস্থা?

এর সরল উত্তর হলো, সরকার তো আর একটা লোক নয়, সরকারের নানা বিভাগ আছে, সরকার-নিয়োজিত নানা কমিটি আছে, আইন ব্যবস্থা আছে, তাছাড়া সংবাদমাধ্যম আছে, NGO আছে, কিন্তু একই ধরনের সমস্যা তো এই সংস্থাগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ, সমস্যা শুধু এই নয় পাহারা দেবে কে, সমস্যা এটাও যে পাহারাদারকে পাহারা দেবে কে?[২]

তিন

যে কোনো খেলার যেমন কিছু লিখিত-অলিখিত নিয়মকানুন থাকে, সেই একই ব্যাপার যে কোনো অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও আছে। আধুনিক অর্থনীতিতে যে কোনো লেনদেনের পেছনে যে নিয়মকানুনের এক আপাত-অদৃশ্য কাঠামো থাকে—যা অবশ্যই স্থান-কাল-নির্ভর—তার ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়। এই কাঠামোর ওপরেই নির্ভর করে সরকারি বা বেসরকারি যে কোনো প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতার ব্যবস্থা।

বাজারের ব্যর্থতা আর সরকারের ব্যর্থতা দুই-এরই পেছনে আছে এই কাঠামোর দুর্বলতা। অর্থনৈতিক লেনদেনের প্রেক্ষাপটে এই যে আপাত-অদৃশ্য কাঠামো, সেটি যে ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে তাকে বলা হয় একটি অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো (institutional infrastructure)।[৩] এই ভিত নড়বড়ে হলে উন্নয়নের খেলা ভণ্ডুল হয়ে যায়, যেমনই থাক বাকি সব সরঞ্জাম।

একটা সহজ উদাহরণ নেওয়া যাক। বাজারের যে অন্যতম মূলসূত্র 'ফেল কড়ি, মাখো তেল', সেই আপাত-সরল কথাটির মধ্যে কিন্তু নিহিত আছে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে আদান-প্রদানের সম্পর্ক বিষয়ে কতগুলি নিয়ম। এর মানে যেমন টাকা না দিলে জিনিস পাওয়া যাবে না (অর্থাৎ ধার বা ভিক্ষে চলবে না) তেমনি বিক্রেতার দিক থেকে এটি একটি প্রতিশ্রুতিও : টাকা দিলে জিনিস পাওয়া যাবে। শুধু তাই না, এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে ক্রেতার 'স্বাধীনতার' স্বীকৃতি : যদি দামে না পোষায়, তিনি তেল নাই কিনতে পারেন। আবার একধাপ পেছোলে, এর মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানাসম্পন্ন অধিকারের একরকমের স্বীকৃতিও আছে : বিক্রেতাকে কড়ি না দিয়ে তার কাছ থেকে তেল কেড়ে নেওয়া চলবে না।[৪] এই সব নিয়ম কেউ ভাঙলে কে করবে সালিশি? সম্ভাব্য উত্তর হলো : সামাজিক চাপ, স্থানীয় কোনো প্রভাবশালী লোক, রাজনৈতিক দল, আইন ব্যবস্থা, অর্থাৎ এই সোজা কথাটির পেছনেও আছে একটি প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বিনিময় যত জটিল হয়, বাজার এবং সরকারের বিস্তার যত ব্যাপ্ত হয়, ততই জটিল হয় খেলার নিয়মকানুন, আর গুরুত্ব বাড়ে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোর।

যেমন, কেউ যখন ঋণ নেন, তিনি পান টাকা, আর তার বিনিময়ে ঋণদাতা পান একটি প্রতিশ্রুতি মাত্র। তাই তেল আর কড়ির তুলনায় এ অনেক জটিল বিনিময়। এই প্রতিশ্রুতির দাম নির্ভর করবে ঋণদাতা এবং ঋণকারীর সামাজিক সম্পর্কের ওপর বা আইনব্যবস্থার ওপর। যেমন, পরিচিতদের মধ্যে হলে ঋণকারীর ওপর ঋণশোধ করার সামাজিক চাপ থাকবে। তা না হলে, বন্ধক রাখতে হবে জমি, বাড়ি বা দোকান এবং ঋণশোধ না করলে, আইনব্যবস্থার সাহায্যে সেই বন্ধক রাখা সম্পত্তি নিয়ে নেবার অধিকার থাকবে ঋণদাতার। তাই যাদের ঋণের সবচেয়ে বেশি দরকার, অর্থাৎ ক্ষুদ্র চাষি বা ব্যবসায়ী তাঁরা অনেক সময়েই ঋণ পাওয়ার অযোগ্য বলে পরিগণিত হন। দরিদ্র বলে ঋণ পাওয়া যাবে না আর ঋণ না পেলে দারিদ্র্য ঘুচবে না এই বিষচক্রে আটকে যায় উন্নয়নের টাকা।[৫]

বাজার এখানেও ব্যর্থ, তাই দরকার সরকারি হস্তক্ষেপ। সরকারের অনেক সুলভ ঋণের প্রকল্প আছে। এই শূন্যস্থান পূরণ করার জন্যই কিন্তু তার খানিক উবে যায় দুর্নীতি এবং অপচয়ে, খানিক যায় পাইয়ে দেবার রাজনীতিতে ভুল লোকের হাতে, আর যেটুকু ঠিক লোকের হাতে পৌঁছয়, তার অনেকটাই শোধ হয় না। এ নিয়ে কারোর হেলদোল নেই, কারণ সরকারি টাকা।

রাস্তা তৈরি, শিক্ষা, ঋণ : বাজার আর সরকার দুয়েরই

ব্যর্থতার গল্পগুলি আসলে অনেকটা একই রকম। প্রয়োজন সরকার-বাজার এই দ্বৈতবাদের যান্ত্রিক কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে ভাবা। আর প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোর সংস্কার। বা খেলা গড়ার খেলা।

চার

সরকার আর বাজারের মধ্যের সীমারেখা পরিবর্তনশীল এবং অনেকাংশেই অস্পষ্ট। এক সময়ে সরকারের অর্থনৈতিক ভূমিকার একটা বড় অঙ্গ ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা। সরকারি ব্যর্থতার পূর্বালোচিত সব কারণের সঙ্গে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের নানা কুফল যুক্ত হওয়ায়, দেশে-বিদেশে এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কার্যকর হয়নি।

বাজারের সমর্থকেরা এর থেকে সিদ্ধান্ত টানেন বেসরকারিকরণ এবং প্রতিযোগিতার 'এক দলা চ্যবনপ্রাশ ঠুকে দিলে' সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ভুলে যান বাজারের ব্যর্থতার কথা। কিন্তু সরকারি প্রতিষ্ঠান আর বেসরকারি লাভ-মুখী (for-profit) প্রতিষ্ঠান ছাড়া তো আরো অনেক ধরনের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান আছে, যেমন অলাভমুখী (non-profit) প্রতিষ্ঠান (যার উদাহরণ হলো NGO বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা), সমবায় সংস্থা গোষ্ঠীভিত্তিক (community-based) সংস্থা, ইত্যাদি।

এইসব সংস্থার সঙ্গে সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা দুয়েরই কিছু মিল আছে। সরকারি সংস্থার মতো অলাভমুখী সংস্থা মুনাফার ভিত্তিতে চলে না। কিন্তু সরকারি সংস্থার তুলনায় এরা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বা কালান্তক লাল-ফিতের প্রকোপ থেকে মুক্ত। তার একটা ইতিবাচক দিক হলো এরা অনেক সময়েই আদর্শবাদী মানুষদের স্বেচ্ছাসেবী বা নামমাত্র মাইনে দিয়ে আকর্ষণ করতে পারেন।[৮]

কিন্তু এসব সত্ত্বেও এই সংস্থাগুলি সর্বরোগহর বটিকা নয়। দায়বদ্ধতার প্রশ্ন এদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এরা যেসব ক্ষেত্রে সক্রিয় (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য) সেখানে কাজের মান যাচাই করা শক্ত। বাজারি কোনো সংস্থার উৎপাদনশীলতা বা কাজের মান যেমন মুনাফার হিসেব থেকেই পাওয়া যায়, এসব ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। তাই দুর্নীতি এবং অপচয়ের সম্ভাবনা থেকেই যায়। আবার সরকার যেমন শেষ হিসেবে ভোটারদের কাছে দায়বদ্ধ, এক্ষেত্রে সেইরকম কোনো দায়িত্ব নেই। কাজেই সরকার আর বাজারের মতো না-সরকার না-বাজার ক্ষেত্রটিতেও প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোর ভূমিকা একই রকমের গুরুত্বপূর্ণ। একদিক থেকে দেখলে মনে হতে পারে এটা হতাশাজনক কথা : সরকার, বাজার, NGO, কেউ কথা রাখেনি, কেউ কথা রাখে না।

আমি তা মনে করি না। প্রথমত, সবক্ষেত্রে সম্ভব না হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রতিযোগিতার সদর্থক ভূমিকা আছে। দায়বদ্ধতার একটি বিশেষ প্রক্রিয়া হলো অর্থনীতিবিদ অ্যালবার্ট হার্শম্যান (Albert Hirschman) যাকে বলেছেন প্রস্থানের বিকল্পের (exit option) চাপ। লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত কোনো পক্ষের একচেটিয়া ক্ষমতা থাকলে অন্য পক্ষের কাছে প্রস্থানের বিকল্পটি আকর্ষণীয় হয় না। তাই প্রথমোক্ত পক্ষের ওপর 'দায়বদ্ধতা'র চাপ কমে যায়। প্রতিযোগিতার ফলে এই চাপ বেড়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে বেসরকারি বিমান সংস্থাগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতার চাপে সরকারি বিমানসংস্থায় টিকিটের দাম কমানো এবং পরিষেবার মান বাড়ার ঘটনাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। ডাক ব্যবস্থায় বেসরকারি ক্যুরিয়র সংস্থাগুলির প্রভাব একই ধরনের। দ্বিতীয়ত, এই সংস্থাগুলি তো আর পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বাজারের ব্যর্থতার জন্যে চাই সরকারি হস্তক্ষেপ, কিন্তু তার মানে কোনো সরকারি সংস্থাকেই সেই কাজের সম্পূর্ণ ভার নিতে হবে এমন কথা তো নেই। ক্ষেত্রবিশেষে সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা এক সঙ্গে কাজ করতে পারে। এবং বাস্তবে করেও থাকে। যেমন কোনো কোনো রাজ্যে গ্রামের সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের খুব দীনদশা হলে তা চালানোর ভার NGO-দের অনুদানসহ দেওয়া হচ্ছে, সরকারি মালিকানা বজায় রেখে এবং কিছু নিয়ন্ত্রণের বিনিময়ে। এইরকম অনেক ধরনের 'সরকারি-বেসরকারি' যৌথ উদ্যোগ (public-private partnership) নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে দেশে-বিদেশে।

পাঁচ

এবার আসি প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোর সংস্কারের কথায়। এই বিষয়টির পরিধি এত বড় এবং আমাদের জ্ঞান এত সীমিত যে আমি এর দু-একটি প্রধান উপাদানের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

সংস্কার বললেই বাম-ডান এর 'তুই বেড়াল না মুই বেড়াল' বলে যে তুমুল ঝগড়া বেঁধে যায় তার মধ্যে চাপা পড়ে যায় এই সহজ কথা : সংস্কার আর বেসরকারিকরণ সমার্থক নয়। প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোর সংস্কার শুধু উন্নয়নের জন্যেই প্রয়োজন নয়, দরিদ্র-শ্রেণীর মানুষের অধিকার বৃদ্ধি এবং তাঁদের উন্নয়নের খেলায় সমান অংশীদার করার জন্যেও তা প্রয়োজন। বিত্তবানদেরও স্পর্শ করে বাজার আর সরকারের ব্যর্থতা কিন্তু তাঁদের কাছে অনেক পথ খোলা

আছে যা দরিদ্র মানুষের কাছে নেই : যেমন, সরকারি হাসপাতাল পছন্দ না হলে বেসরকারি নার্সিংহোমে যাওয়া, চেনাজানা কাউকে ধরে সরকারি দপ্তরে কাজ করিয়ে নেওয়া, বা প্রয়োজন হলে মোটা অঙ্কের ঘুষ দেওয়া।

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের একটা প্রধান অঙ্গ হলো আইনব্যবস্থার সংস্কার। এই বিষয়ে মলিমথ কমিটির রিপোর্টে (২০০৩) আইনব্যবস্থার একটি প্রধান সমস্যা বলে চিহ্নিত হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় বিচারকের সংখ্যার অপ্রতুলতা। আশ্চর্য নয়, এ দেশে প্রতি এক কোটি মানুষ প্রতি বিচারকের সংখ্যা ১০০, যেখানে উন্নত দেশগুলিতে এই সংখ্যা ৫ থেকে ১০ গুণ বেশি। তার অবধারিত ফল হলো দীর্ঘসূত্রতা : ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৯-এর মধ্যে আইনমন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী সারা ভারতে বিচারক-প্রতি এক বছরের বেশি পুরোনো মামলার সংখ্যা ছিল প্রায় ন'শোর কাছাকাছি। এই পরিসংখ্যানে পুরো ছবিটা ধরা পড়ে না, কারণ সময় এবং অর্থের অপচয় হবে এই ভয়ে ন্যায্য কারণ থাকলেও মানুষ আদালতের ধারেকাছে যেতে ভয় পান।

কিন্তু আইন-ব্যবস্থার সংস্কারেও দায়বদ্ধতার বিষয়টি অগ্রাহ্য করা যায় না। উকিল এবং বিচারক (এবং অনেক সময় বিবাদীপক্ষও) কারোর কোনো গরজ নেই তাড়াতাড়ি মামলার নিষ্পত্তি করার। আরেকটা সমস্যা হলো অনেক মামলার বাদী-বিবাদী দুই পক্ষই হলো সরকার (অর্থাৎ, তার আলাদা আলাদা বিভাগ)। সরকার ঘরের বিবাদ ঘরেই মিটিয়ে নেবার ব্যবস্থা করলে আইনব্যবস্থার ওপর চাপ কমে।

আরেকটি বিষয় হলো জমি, সম্পত্তি এসবের উপযুক্ত দলিল পাবার প্রক্রিয়ার সরলীকরণ। অনেক মামলার মূলেই আছে স্বচ্ছ দলিল ব্যবস্থার অভাব। এ বিষয়ে কিছু কিছু রাজ্যে (যেমন কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ) জমির মালিকানা সংক্রান্ত সব তথ্য কম্পিউটারের মাধ্যমে একত্র করার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা অনুধাবনযোগ্য। কৃষকেরা চাইলে খুব সহজে নামমাত্র মূল্যে এই তথ্যভাণ্ডার থেকে তাঁর জমি সংক্রান্ত দলিল সংগ্রহ করতে পারেন। শিল্পায়নে কৃষিজমি অধিগ্রহণ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে বিতর্ক চলছে, তাতে এইরকম তথ্যভাণ্ডারের অভাব বোঝা যায়।

আইনব্যবস্থার কাঠামোয় সংস্কার অবশ্য প্রয়োজনীয়, কিন্তু দায়বদ্ধতার সমস্ত দায়িত্ব আইনব্যবস্থার ওপরে ছেড়ে দেওয়াটা বাস্তবসম্মত নয়। বাঙাল বা ঘটি কাউকেই কথায় কথায় হাইকোর্ট দেখালে আমলাতন্ত্রের বদলে মামলাতন্ত্রের কাজে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা।[৭] শুধু তাই না, আর সমস্ত ক্ষেত্রে যেমন, আইন ব্যবস্থার সংস্কার করলে খেলার নিয়ম স্বচ্ছ হবে কিন্তু তাই বলে দরিদ্র-বিত্তবান সবার জন্যে রাতারাতি সমান হয়ে যাবে না। সে দিক থেকে দায়বদ্ধতা-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের বিশেষ ভূমিকা আছে।[৮] আর তার জন্যে আপামর জনসাধারণের পক্ষে চাই তথ্যের সহজলভ্যতা।

শুরু করি সংবাদ-মাধ্যমের ভূমিকা দিয়ে। দাঙ্গা-রোধে প্রশাসনিক ব্যর্থতা থেকে দুর্নীতি উদ্ঘাটন, আমাদের দেশে সংবাদ-মাধ্যমের সক্রিয় ও সদর্থক ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু সংবাদমাধ্যমেরও দায়বদ্ধতার প্রশ্ন আছে। রাজনৈতিক পক্ষপাত নয় বাদই দিলাম, গুজরাটে দাঙ্গা নিয়ে ইংরেজি সংবাদ মাধ্যমের প্রশংসনীয় ভূমিকার পাশাপাশি স্থানীয় ভাষায় কিছু সংবাদপত্রের সেই একই দাঙ্গার আগুনে ঘৃতাহুতি দেবার কথা ভুললে চলবে না। এখানে সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায় (আর সরকার নিজেই অপরাধী হলে তো কথাই নেই)। তবে আশার কথা এই যে আধুনিক প্রযুক্তির সুবাদে সংবাদ আহরণের নতুন নতুন রাস্তা খুলে যাওয়ায় (যেমন ইন্টারনেট, কেবল টিভি) দায়বদ্ধতার রাশ এখন খানিকটা সাধারণ নাগরিকদের হাতে।[৯]

আর প্রয়োজন সরকারি এবং বেসরকারি প্রকল্পের আয়-ব্যয় এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে তথ্যের ওপর নাগরিকদের অধিকার। এই বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভারত সরকারের সম্প্রতি পাশ করা তথ্য স্বাধীনতা আইন (২০০৩)। অবশ্যই আইন পাশ করা আর তার রূপায়ণের মধ্যে অনেক ফাঁক আছে। তার ওপর সরকারের পক্ষ থেকেই এই আইন সংশোধনপূর্বক কমজোরি করে দেবার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তা আশঙ্কাজনক। তবু এই প্রক্রিয়ার সম্ভাব্য গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই আইনের সাহায্যে কিছু কিছু রাজ্যে এন জি ও-দের নেতৃত্বে স্থানীয় নাগরিকরাই সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতি উদ্ঘাটন করতে সফল হয়েছেন। উন্নয়ন এবং দরিদ্র শ্রেণীর মানুষদের উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় অংশীদার হবার লক্ষ্যগুলি যে পরস্পরবিরোধী নয়, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের এই উদাহরণটিতে সেই সম্ভাবনার ইঙ্গিত আছে।

ছয়

উন্নয়নের খেলায় গড়তে চাই প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোর সংস্কার বা খেলা গড়ার খেলা। খেলায় হারজিত থাকে; সে উন্নয়নের খেলা আর সংস্কারের খেলা, যাই হোক। যেমন, তথ্যের অধিকারে দরিদ্র মানুষের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সরকারি কর্মচারী বা রাজনৈতিক দলের নেতাদের ক্ষমতা খর্ব হয়। যারা হারবে বা হারতে পারে এই আশঙ্কার মুখোমুখি

তারা মেতে উঠবে খেলা ভণ্ডুল করার খেলায়। গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠরা খাতায় কলমে ক্ষমতাবান। কিন্তু সংখ্যালঘু কোনো গোষ্ঠী (যেমন উপরোক্ত উদাহরণে সরকারি আমলারা) যদি সংগঠিত এবং প্রভাবশালী হয়, তাহলে স্থিতাবস্থা বদলানোর পথ হয়ে দাঁড়ায় বন্ধুর। অর্থনীতির খেলা মিশে যায় রাজনীতির খেলায়। সে আরেক লম্বা গল্প।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : এই লেখাটির বিষয়বস্তু নিয়ে অভিজিত বিনায়ক ব্যানার্জি, প্রণব বর্দ্ধন এবং টিম বেসলির সঙ্গে, আর অর্থনৈতিক পরিভাষার বাংলা অনুবাদ নিয়ে অশোক মুখোপাধ্যায় এবং মনীষীতা দাসের সঙ্গে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি।

টীকা

১. কবিতাটির শব্দ অদল-বদল করার জন্যে মার্জনা-প্রার্থী।

২. আর পাহারাদারের পাহারাদারকে পাহারা দেবে কে? সরলরেখার জ্যামিতিতে এ এক অনন্ত হেঁয়ালি, কিন্তু সরলরেখা নমনীয় হলে যে কোনো বিন্দু (অর্থাৎ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান) অন্য যে কোনো বিন্দুর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে দায়বদ্ধতার সম্পর্কে।

৩. আধুনিক উন্নয়নের অর্থনীতিতে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোর ভূমিকা নিয়ে Douglass North (1991) দ্রষ্টব্য।

৪. আর অবশ্যই তৃতীয় কোনো ব্যক্তির ক্রেতার কাছ থেকে কড়ি আর বিক্রেতার কাছ থেকে তেল দুই-ই কেড়ে নেওয়া চলবে না।

৫. দরিদ্র না হলেও, আইন ব্যবস্থা যদি কার্যকর না হয়, তাহলেও এই একই সমস্যা হবে।

৬. এই নিয়ে Basley and Ghatak (2006) দ্রষ্টব্য।

৭. নিন্দুকের মতে সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের এই হলো মূল তফাৎ।

৮. এই রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সংস্কার এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সদর্থক পদক্ষেপ। এ বিষয়ে অন্যত্র বিশদ আলোচনা করেছি (Ghatak and Ghatak, 2002) তাই আর পুনরাবৃত্তি করলাম না।

৯. ইরাক যুদ্ধ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আপাতমুক্ত সংবাদ মাধ্যমের ওপর ভরসা না রাখতে পেরে আমার পরিচিত অনেকেই বিবিসি বা ইন্টারনেটের ওপর নির্ভর করেন।

উল্লেখপঞ্জী :

Besley, T. and M. Ghatak. (2006) : 'Public Goods and Economic Development' in *Understanding Poverty,* edited by A.V. Banerjee, R. Benabou, and D. Mookherjee, Oxford : Oxford University Press.

Ghatak, M. and M. Ghatak 'Recent Reforms in the Panchayat System in West Bengal : Toward Greater Participatory Governance?' *Economic and Political Weekly of India,* Vol 37, No. 1, January 5, 2002.

Hirschman, A.O. (1970): *Exit, Voice and Loyalty*, Cambridge, MA: Harvard University Press.

North, Douglass (1991): 'Institutions', *Journal of Economic Perspectives,* Vol. 5, No. 1 (Winter), p 97-112